বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ

লক্ষ শিশুর প্রেরণার দিন

সেলিনা হোসেন

১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস। এ বছর এই দিনে উদ্‌যাপিত হবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের শতবর্ষের জন্মদিন। এই জন্মদিন লক্ষ শিশুর মানবিক চেতনায় শুভবোধ নিয়ে গড়ে ওঠার প্রতীকী দিন। জাতির পিতা, স্বাধীনতার স্থপতি, ইতিহাসের মহামানবের ত্যাগ, সাহস এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসার শিক্ষা নিয়ে বড়ো হবে শিশুরা। শুভবোধের চেতনায় আলোকিত রাখবে নিজেদের শিক্ষার নানা দিকের সবটুকু ধারণ করে। মানুষ হবে দেশের প্রকৃত ইতিহাস জেনে। অঙ্গীকারাবদ্ধ হবে সেই ইতিহাস ও চেতনাকে সঠিকভাবে রক্ষা করার প্রেরণায়। দেশ, জাতি, মানুষ সংক্রান্ত ভাবনায় জাতির পিতার জন্মদিন এ দেশের শিশুদের বেড়ে ওঠার বিকাশে একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ দিন।

শৈশব থেকেই তাঁর মানস চেতনায় দুটো জিনিস খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এক. মানুষের প্রতি ভালোবাসা। দুই. অধিকার আদায়ের সচেতনতা। স্কুল থেকে ফেরার পথে তিনি শীতে কাঁপতে থাকা বুড়োকে গায়ের চাদর খুলে দিয়েছিলেন। বর্ষাকালে গরিব বন্ধুটি ভিজে স্কুলে এসেছিল দেখে নিজের নতুন ছাতাটি বন্ধুকে দিয়ে দিয়েছিলেন। শৈশব থেকে এভাবে নিজস্ব আলোকে মানুষের অবস্থা বুঝতে শিখেছিলেন। মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজনকে সম্মান করতে শিখেছিলেন। আজকের বাংলাদেশের শিশুদের এই মানবিক বোধ সম্পন্ন হয়ে বড়ো হয়ে ওঠা খুব জরুরি। তাই মহৎ মানুষের জীবনটিকে সামনে রেখে তাদের নৈতিকবোধে গড়ে তোলা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৪ জানুয়ারি রমনা রেসকোর্সে যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেখানে উল্লেখ করেছিলেন : 'বাংলার মানুষ বিশেষ করে ছাত্র এবং তরুণ সম্প্রদায়কে আমাদের ইতিহাস এবং অতীত জানতে হবে। বাংলার যে ছেলে তার অতীত বংশধরদের ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারেনা সে ছেলে সত্যিকারের বাঙালি হতে পারে না। আজও বাংলাদেশের গৌরবময় ইতিহাস রচিত হয়নি। নতুন করে বাঙালির ইতিহাস রচনা করার জন্য দেশের শিক্ষাবিদদের প্রতি আমি আহ্বান জানাচ্ছি। এই ইতিহাস পাঠ করে যেন বাংলার ভবিষ্যৎ বংশধররা তাদের গৌরবময় অতীতের পরিচয় পেয়ে গর্ব অনুভব করতে পারে এবং মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে'।

গোপালগঞ্জের মিশন স্কুলে পড়তেন তিনি। একবার স্কুল পরিদর্শনে আসেন শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ মন্ত্রী দুজন পরিদর্শন শেষে চলে যাওয়ার সময় বঙ্গবন্ধু কয়েক জন ছাত্রসহ তাঁদের সামনে গিয়ে দাঁড়ান। বলেন, বৃষ্টির সময় স্কুলের হোস্টেলের ছাদ চুঁইয়ে পানি পড়ে। ফলে ছাত্রদের অসুবিধা হয়। পড়াশোনায় ব্যাঘাত হয়। তাঁরা দুজনই স্কুল ছাত্রের সাহসী ভূমিকা দেখে খুশি হন। অধিকার আদায়ের জন্য দৃঢ়চিত্ত হওয়া যে জরুরি তা তিনি সেই বয়সেই বুঝেছিলেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এই সাহসকে অভিনন্দন জানান। নিজস্ব তহবিল থেকে হোস্টেলের ছাদ মেরামতের প্রয়োজনীয় টাকা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। দুজন মানুষই স্কুলের ছাত্রের ব্যক্তিত্ব দেখে মুগ্ধ হন। বুঝতে পারেন যে অধিকার আদায়ের পক্ষে নির্ভীক, সে অনেক দূর যাবে।

১৯৭৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জাতিসংঘে ভাষণ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'আজ এই মহামহিমান্বিত সমাবেশে দাঁড়াইয়া আপনাদের সাথে আমি এইজন্য পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির ভাগীদার যে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ এই পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পূর্ণতা চিহ্নিত করিয়া বাঙালি জাতির জন্য ইহা এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত।

স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার অর্জনের জন্য এবং একটি স্বাধীন দেশে মুক্ত নাগরিকের মর্যাদা নিয়া বাঁচার জন্য বাঙালি জনগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী সংগ্রাম করিয়াছেন, তাহারা বিশ্বের সকল জাতির সঙ্গে শান্তি ও সৌহার্দ্য নিয়া বাস করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন। যে মহান আদর্শ জাতিসংঘ সনদে রক্ষিত আছে, আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই আদর্শের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন।

আমি জানি, শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সকল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের উপযোগী একটি বিশ্ব গড়িয়া তোলার জন্য বাঙালি জাতি পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আমাদের এই অঙ্গীকারের সহিত শহিদানের বিদেহী আত্মাও মিলিত হইবেন। ইহা বিশেষ আনন্দের ব্যাপার যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন সক্রিয় যোদ্ধা সভাপতি থাকা কালেই বাংলাদেশকে এই পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেওয়া হইয়াছে'।

তাঁর সাহস, শিক্ষা, জ্ঞানবুদ্ধি, মেধা দিয়ে টুঙ্গিপাড়ার মতো বাংলাদেশের একটি গ্রাম থেকে বিশ্বের সর্বোচ্চ জায়গায় পৌঁছে ছিলেন, একটি স্বাধীন দেশের স্থপতি এবং জাতির পিতার গৌরব নিয়ে। তাঁর জন্মদিন শিশুদের জন্য জাতীয় শিশুদিবস। এটি শুধু একটি দিন মাত্র নয়। সেই মানুষটি সম্পর্কে জানতে হবে শিশুদেরকে। জানতে হবে কীভাবে তিনি দেশ ও দেশের মানুষকে শৈশব থেকে জানতে শিখেছিলেন।

১৯৭৫ সালের ১৭ মার্চ গণভবনে শিশুদের মাঝে

১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম বিশ্ব শিশুদিবস পালিত হয়। আয়োজক ছিল ইউনিসেফ ও আন্তর্জাতিক শিশু কল্যাণ ইউনিয়ন। এখন অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব শিশুদিবস হিসেবে পালিত হয়। গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সংঘটিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অসংখ্য শিশু এতিম হয়ে পড়ে। হারায় আশ্রয়, বেঁচে থাকার নিরাপত্তা। ১৯২৪ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয় লীগ অব নেশনস্-এর কনভেনশন। সেই কনভেনশনে ঘোষণা করা হয়, মানব জাতির সর্বোত্তম যা কিছু দেবার আছে, শিশুরাই তা পাওয়ার যোগ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আবার লক্ষ লক্ষ শিশু এতিম ও অসহায় হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, পারমানবিক বোমার তেজস্ক্রিয়তায় অসংখ্য শিশু বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে। ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘ শিশু অধিকার বিষয়ক সনদটি জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত হয়। সনদে স্বাক্ষর দাতা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ছিল অন্যতম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের বাংলাদেশ।

একথা সত্যি বিশ্ব শিশুদিবস শিশুদেরকে আন্তর্জাতিক চেতনা বিকাশে সহায়তা দেয়। আর জাতীয় শিশু দিবস শিশুদেরকে নিজের জাতিসত্তায় বিকশিত করে। তাকে ঐতিহ্য বুঝতে শেখায়। তার সংস্কৃতিকে লালন করার জন্য অনুপ্রাণিত করে। যে কোনো শিশু পৃথিবীর যে দেশেই থাকুক না কেন তাকে নিজের জাতিতাত্ত্বিক পরিচয়েই মাথা তুলে থাকতে হয়। এই দিক বিবেচনা করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা।

বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থে তিনি স্কুলের বালিকাদের ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার বিষয়টি নিজের সুদূরপ্রসারী চিন্তায় একটি বিশাল লক্ষ্য অর্জনের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। একজন রাজনৈতিক নেতা কত দূরদর্শী সম্পন্ন হন বঙ্গবন্ধুর এই ভাবনা শিশুসম্পর্কিত চিন্তাকে মহীয়ান করে। তিনি সে সময় ঢাকার কারাগারে রাজবন্দি ছিলেন। বইয়ের ৯৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "যে ওয়ার্ডে আমাদের রাখা হয়েছিল, তার নাম চার নম্বর ওয়ার্ড। তিনতলা দালান। দেওয়ালের বাইরেই মুসলিম গার্লস স্কুল। যে পাঁচ দিন আমরা জেলে ছিলাম সকাল দশটায় মেয়েরা স্কুলের ছাদে উঠে স্লোগান দিতে শুরু করত, আর চারটায় শেষ করত। ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা একটু ক্লান্তও হত না। 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই', 'বন্দি ভাইদের মুক্তি চাই', 'পুলিশি জুলুম চলবে না'- নানা ধরনের স্লোগান। এই সময় শামসুল হক সাহেবকে আমি বললাম, "হক সাহেব ঐ দেখুন, আমাদের বোনেরা বেরিয়ে এসেছে। আর বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা না করে পারবে না"। হক সাহেব আমাকে বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ, মুজিব"।

বালিকাদের স্লোগান দেওয়াকে তিনি কত মর্যাদার সঙ্গে দেখেছেন এটি তার চেতনার বড়ো দিক। শিশুরাও তাঁর কাছে ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রবল শক্তি। মনে করেননি ওরা যা করছে তা দিয়ে কিছু হবে না। এভাবেই বঙ্গবন্ধু তাঁর চিন্তা-চেতনায় দেশবাসীর প্রতিটি জায়গাকে মূল্যায়ন করেছেন। এটিই তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের বড়ো দিক।

তিনি তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থের শুরুতে লিখেছেন : 'একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসাবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে'।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষের দিনটি শুধু একটি মাত্র দিন নয়, তরুণ প্রজন্মের মানবিক শিক্ষায় একটি বড়ো দিক, নিজেদের জীবনযাপনের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ চর্চা করলে নিজেদের শাণিত করা যাবে। এই শিক্ষা নিয়ে বড়ো হোক এই প্রজন্ম।

লেখক : কথাসাহিত্যিক ❑